অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রণাম করো। তোমার দিদিশাশুড়ি। ভিড় থেকে আত্মীয়-পরিজনের কে কথাটা বললেন চাঁপা বুঝতে পারল না। প্রায় অন্ধকার ঘরে তিনি শুয়ে আছেন। ঘরে ওষুধের গন্ধ। ডেটলের গন্ধ কিংবা ফিনাইলের গন্ধ, ঠিক কীসের গন্ধ সে বুঝতে পারছে না। সারা রাস্তায় ট্রেনের ধকল গেছে, বিয়ের পাট চুকতে হোমের কাজ শেষ করতে প্রায় রাত কাবার। সারারাত ঘুমোয়নি। সকালেও বান্ধবীরা ছেড়ে যায়নি, ঠাট্টাতামাশায় তাকে উদব্যস্ত করে রেখেছিল। ট্রেনে সামান্য ঝিমুনি, ঘুম বলতে এইটুকু।

শেষে এই বাড়ি।

বাবা বলছেন, এখন থেকে আমরা আর তোমার কেউ না। বাবাজীবনের হাত ধরে বলেছেন, দ্যাখো বাবা ভুলত্রুটি হলে শুধরে নিও। বেয়াইকে বলেছেন, আমার ঘর খালি হয়ে গেল, আপনার ঘর ভরে গেল। আপনি ভাগ্যবান।

এমন সব নানা কথাই মনে পড়েছিল তার। শেষ পর্যন্ত প্রায় অন্ধকার ঘরে কারা তাকে যে নিয়ে এল! পাশে রূপক আছে এই রক্ষা। সে এখনও কাউকেই নিজের মনে করতে পারছে না। অপরিচিত মানুষজন যে যা বলছে করে যাচ্ছে।

রূপক বলল, দাঁড়িয়ে থাকলে কেন। প্রণাম করো। আমার ঠাকুরমা। বৃদ্ধা উঠে বসার চেষ্টা করছেন। তারপর কেমন মিনমিনে গলায় বললেন, কাপড়টা পরতে দে বাবা। বোধহয় এতই কাহিল, সারাদিন এই ঘরটা থেকে নড়তে পারেন না। অস্থিচর্ম সার এই বৃদ্ধাকে প্রণাম করার সময় কেমন একটা অস্বস্তি হচ্ছিল। চোখ কোটর গত। চুল শণের মতে, নাতবউকে একজোড়া বালা দিয়ে আশীর্বাদ করলেন। রূপকের সম্পর্কে এক পিসি বালাজোড়া পরিয়ে দিল। সে তো কিছু বলতে পারছে না। বুড়ি ঠাকুমার দিকে তাকাতে পর্যন্ত ভয় পাচ্ছে। বুকের হাড়-পাঁজর দেখা যায়, কতক্ষণে বের হয়ে আসবে।

এই বাড়িতে তাকে থাকতে হবে। তিনি যদি ঘরের বার না হতে পারেন অস্বস্তি কম হবে। যদি বের হতে পারে, সারাদিন প্রায় যেন, তবে চামড়া দিয়ে ঢাকা একটা কঙ্কাল তার সঙ্গে ছায়ার মতো ঘুরে বেড়াবে। কেমন আতঙ্ক ধীরে ধীরে তাকে গ্রাস করছিল।

রাতে রূপক বুকে টেনে নিলে বলল, তোমার ঠাকুমার কী অসুখ?

অসুখ হবে কেন। বয়সের ভার।

চলাফেরা করতে পারেন?

পারেন। তবে বিছানা থেকে একা নামতে পারেন না। ধরতে হয়। দেয়াল ধরে হাঁটেন। বিছানায় পড়ে থাকলে বেডসোর হতে পারে। বাবাকে যমের মতো ভয় পান। সকালে বাবা ধরে নিয়ে যান, বারান্দার ইজিচেয়ারে বসিয়ে দেন। যেখানে বসিয়ে দেবেন, আর নড়বেন না।

চাঁপা বলল, জান আমার না ভয় করে।

কীসের ভয়।

কী ভয় বুঝতে পারছি না।

সে বলতে পারছে না, বাথরুম কিংবা কোনো কাজে একা পড়ে গেলে, তিনি যদি হেঁটে এসে সামনে দাঁড়ান, তার সাহস নেই সামনে দাঁড়িয়ে থাকার।

বাড়িটাতে অবশ্য লোকজন কম না। শ্বশুর শাশুড়ি ননদ জা এবং তাদের ছেলেমেয়ে, দুই মেয়ের জামাই, বাড়িটায় অনেকগুলি ঘর, ঘরের মতোই মানুষজনেরা গিজগিজ করছে। ছোটো দুই দেওর ঠাকুমাকে টেনে তুলে দাঁড় করিয়েছে। বুড়ি রসিকতায় বেশ তুখোড়, কি লা কোমরে জোর আছে তো। দেখিস মিনসের চাপে তুবড়ে যাস না।

অশ্লীল কথাবার্তা। সে তো একমাত্র মেয়ে, বাবা রেলে কাজ করেন। কত দেশ তারা দেখেছে, ঘুরেছে। মা বাবা আর সে। স্কুলের বাসে ফিরেছে। কোয়ার্টারের লনে ব্যাডমিন্টন খেলেছে। সাদা ফ্রক গায়, পায়ে কেডস। তারপর তার নিজের টেবিল, জটায়ুদা এক গ্লাস দুধ নিয়ে হাজির—দুধ দেখলেই তার মাথা গরম, কত সাধ্যসাধনা, এবং সে কখনো কোনো বুড়ো মানুষ বাড়ির আত্মীয়স্বজনদের মধ্যে দেখেনি। এমন অস্থিচর্মসার তো নয়ই। তার দাদুমণি ঠাকুমা, দিদিমা দাদু বেড়াতে এসেছেন, কিন্তু কী সবল আর হাসিখুশি! মানুষের মুখ তোবড়ানো টিনের মতো হয়, আর দেখলে ভিতরটা এত ঠাণ্ডা মেরে যায় রূপকের ঠাকুমাকে না দেখলে বিশ্বাসও করতে পারত না। কী বিকট চোখ মুখ। ঠোঁট দুটো সাদা। ঠোঁটের কশে ঘা। দাদমণি মারা গেলে বাবা একা গেলেন। ঠাকুমার এখন-তখন, বাবা সবাইকে নিয়ে দেশের বাড়িতে গেলেন। সেও

কাটোয়া ইস্টিশনে নেমে ছোটো লাইনে, তারপর কিছুটা গোরুর গাড়ি এবং হাঁটা পথে। সে যে খুব বিরক্ত বাবা ফিরে এসে ভালোই টের পেয়েছিলেন। তবে বাবার জ্ঞাতিগুষ্টির কেউ বুঝতে পারেনি, গাঁয়ের বাড়িতে চাঁপার দম বন্ধ হয়ে আসছে। ময়লা, নোংরা জামাকাপড়, হাঁটুর ওপর ধুতি, গালে দু-পাঁচদিনের বাসি দাড়ি, দরকচা মারা সব মানুষজন, আলাদা বাথরুম নেই, আলো নেই, পাখা নেই—সে হাঁপিয়ে উঠেছিল।

এই বাড়িটায় সব আছে। একতলা বাড়ি, বিশাল ডাইনিং স্পেস। ছেলেদের আলাদা ঘর। শেষদিকের দুটো ঘরে রূপকের বাবা মা থাকেন। সে রূপকের বাবাকে এখনও বাবা বলে ডাকতে পারছে না। তবে রূপকের মাকে মা ডাকতে সংকোচ হচ্ছে না তার। সে সারাদিনই মা মা করছে। বাড়িটার সব এত সুন্দর, কেবল বিকট ভূতুড়ে বুড়িটা বাড়িটাকে হত কুৎসিত করে রেখেছে। একদম বেমানান।

বউভাত হয়ে যাবার পর বাড়ি খালি হয়ে গেল।

চাঁপা এখনও কাজে হাত দেয়নি। মা বলছেন, তোমরাই তো করবে। আমার তো বয়স হয়ে গেল। আর পেরেও উঠি না। কাজের লোকের হাতে রান্না কেউ খেতে চায় না। তৃপ্তি

পায় না। নিজের মানুষদের জন্য রান্নাবান্নায় আনন্দ আছে চাঁপা। আনন্দটা খুঁজে নিতে হয়। যতদিন পারব, করব। তারপর তোমরা ছাড়া কে করবে।

চাঁপা দরজার পাশে হেলান দিয়ে সব শোনে।

নাও। তোমার ঠাকুমার ঘরে চা দিয়ে এস। ব্যস শরীরে জ্বর এসে যায়। বুড়ি কীভাবে পড়ে আছে কে জানে। ঘরটায় ঢুকতেই তার ভয় হয়। সারা গা চুলকায়। মরামাস ওঠে। হাঁটুতে দগদগে ঘা। মলম লাগানো বলে ঘা আরও কুৎসিত দেখায়। ঘরে ঢুকলে পচা গন্ধও পায়। পা দুটো অস্বাভাবিক ফোলা। যেন টিপে দিলে পুঁজরক্ত বের হয়ে আসবে। মাথার চুল কাগে বগে ঠুকরে নিয়েছে।

মা, ঠাকুমা সকালে চা খায় বুঝি?

খায় পেলে। বুড়ো মানুষ, মাথাও ঠিক নেই। সবাই খেলে তাঁকে দিতে হয়। খান না-খান দেখি না। খুশি থাকলে খাবেন, অখুশি থাকলে কিছুতেই খাওয়ানো যাবে না। তোমাকে দেখে খুব আহ্লাদ হয়েছে। গুনগুন করে গান গাইছিলেন। তোমার বাবাকে ডেকে বললেন, নতুন বউকে আমার পাশে বসে থাকতে বলো।

মা।

কী!

আমার বাথরুম পেয়েছে।

ঠিক আছে যাও। আমি দিয়ে আসছি।

বউমা তুমি! নাতবউ কোথায়।

ও বাথরুমে গেছে।

আমার নাতবউ কী সুন্দর! ঘর আলো করে রেখেছে। ও কাছে থাকলে বড়ো আনন্দ হয়।

চাঁপা বাথরুমে ঢুকে অক অক করে বমি করল। কেন ওক উঠে এল বুঝতে পারছে না। তারপর মুখ মুছে আয়নায় মুখ দেখল। বড়ো সিঁদুরের ফোঁটা কপালে, সিঁথিতে সিঁদুর রক্তবর্ণ ধারণ করে আছে। সে যে সত্যি ঘর আলো করে আছে আয়নায় নিজেকে দেখলে আরও বেশি টের পায়। ভুরু প্লাক করা। চোখে আইল্যাশ। সকালে ঘর থেকে বের হবার সময়, একেবারে পরিপাটি হয়ে বের হয়েছে। ঘরে ঘরে অ্যাটাচড বাথ। রূপক ঘরে নেই। ঘরে ঢোকার আগে দরজা বন্ধ করে দিয়েছিল।

বাড়িটা এত সুন্দর, আর এই বৃদ্ধা বাড়িটাতে কেন যে আছে! না থাকলে কি ক্ষতি ছিল! বাড়ির এক কোণায় পড়ে থাকলেও যেন এক কদর্য অনুভূতি সারা বাড়িটায় ছড়িয়ে রেখেছে।

তোমাকে ডাকলাম, সাড়া পেলাম না। কোথায় ছিলে।

মা, আমি শুনতে পাইনি। ঘরেই ছিলাম।

আতঙ্ক আবার সেই অন্ধকারে মৃতপ্রায় এক রমণীর কাছে তাকে গিয়ে না দাঁড়াতে হয়। মা বললেন, ভয় কীসের। যা কিছু দেখছ সবই তাঁর দয়ায়। তিনি ছিলেন বলে এই

সংসার। তোমার বাবারা চার ভাই দু-বোন। কেউ ফেলনা নয়। তিনি তো গাছের মতো আছেন। কত সকালে ফুল ফুটেছে, ফল হয়েছে তারপর হাওয়ায় বীজ উড়ে গেছে কখন, তিনি নিজেও জানেন না। বীজ এখন গাছ হয়ে গেছে। নতুন গাছে নতুন ফুল। ফল। সব কিছু। তাঁকে ভয় পাবার কি আছে। তিনি তো ন্যাড়া গাছ।

শাশুড়িমা ঠিক ধরে ফেলেছেন। সে ঘরটায় যেতে অস্বস্তি বোধ করছে।

বরং নিজের মতো বউমা কাজ খুঁজে নেয়। ঘরে ঢুকে টেবিল চেয়ার, ঝাড়ন দিয়ে পরিষ্কার করে। গ্রিলের ময়লা ন্যাকড়ায় মুছে দেয়। এক দণ্ড যেন তার বসে থাকার উপায় নেই। আসলে তিনি কখন কী বেশে থাকবেন তাও বলা যায় না। সর্বাঙ্গ খালি। কেবল কোমরের নীচে কোনোরকমে কাপড়টুকু গুঁজে রাখেন। গায়ে কিছু রাখতে পারেন না। বুক শুকিয়ে স্তন দুটি জরুলের মতো হয়ে গেছে। চামড়া কুঁচকে অসাড় হয়ে গেছে। মানুষকে তো আর মেরে ফেলা যায় না যতদিন আছে। সেবা শুশ্রুষা করে যেতেই হবে।

চাঁপা সারাক্ষণ এ-ঘর ও-ঘর করে। শুধু ওই ঘরটায় দিকে তাকাতে পারে না। খেতে বসলেও অস্বস্তি। কখন না বের হয়ে এসে পাশে দাঁড়ান-মাথায় হাত রেখে নাতবউকে আদর করেন। পারতপক্ষে সে একা খেতে বসে না। খাওয়া তো নয় গেলা। তারপর

নিজের ঘরে সারা দুপুর দরজা বন্ধ করে থাকা। রূপকের মোটরবাইকের শব্দ পেলেই সে উঠে বসে। জানালা খুলে মুচকি হাসে। ধড়ে তার প্রাণসঞ্চার হয়।

ওই ঘরটা এড়িয়ে চলার বিষয় ধীরে ধীরে সবার নজরে পড়ে গেছে। চাঁপা অপরাধী মুখে সবার সঙ্গে কথা বলে। শ্বশুরমশাই ঘরে তখন শাসাচ্ছেন, কাপড় খুলে ফেলছ কেন? চল বারান্দায় বসবে।

শরীরে কী আর কাপড়ের দরকার আছে বাবা। কাপড় যে রাখতে পারি না। এখন থাক সময় হলে না হয় কাপড় দিয়ে সারা শরীর ঢেকে দিস।

বাবা বোধহয় জোর করে শায়া পরিয়ে দিচ্ছে।

বুড়ির চিলচিৎকার, আরে অধম্মের বেটা, আমাকে তুই মেরে ফেলতে চাস। শরীরে কিছু না থাকলে কী হয়!

চাঁপা জানে বাবা নিজেই বুড়ির কাপড় শায়াতে গুঁজে, সারা শরীর কাপড়ে ঢেকে, ধরে ধরে বারান্দায় এনে বসিয়ে রাখবেন। যতক্ষণ পারা যায়, ঝিম মেরে বসে থাকেন আর বিড়বিড় করে বকেন। শাপশাপান্ত করেন কি না সে জানে না। কারণ বুড়ি যেদিকটায়, সে তার বিপরীত দিকে। চোখে পড়ে যাবে ভেবে সে এখন সোজা তাকিয়ে হাঁটে না।

দেখলে বমি উঠে আসে। মানুষ তো না কঙ্কাল। রাতের বেলা ঘরে একলা ঢুকতেও ভয়। রূপক কিছুক্ষণ তার ঠাম্মার ঘরে বসে মজা করে। অন্য দুই দেওর মন্টু ও রন্টুও ঠাম্মাকে নিয়ে রঙ্গেরসে মেতে যায়। তার তখন রাগ হয়। ঘেন্নাপিত্তি নেই।

রূপক ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে জড়িয়ে ধরতে গেলেই এক কথা—না। আমার কিছু ভালো লাগছে না। হাত পা ভালো করে ধুয়ে এসো। তারপর চোখের জলে ভাসায়। বাপের বাড়ি দিয়ে আসতে বলে। এত আতঙ্ক আর অস্বস্তি নিয়ে সে এই সংসারে আর লেপটে থাকতে রাজি না। বুড়ির শেষ খবর পেলে সে আবার ফিরে আসবে। তবে মুখে কিছু বলে না। মাঝে মাঝে বাপের বাড়ি যাবার জন্য বায়না ধরে ঠিক, কিন্তু সবাই বুঝিয়ে বললে, নিজেকে কেন জানি বোকা লাগে। রূপককে ছেড়ে থাকতেও তার এখন কষ্ট। কী যে করে।

সারাদিন আজ সে ওদিকে মাড়ায়নি। সে আজ বেশ খুশি। জানালায় তার মুখ যে যায় সেই বলে ধীরাজবাবুর পুত্রবধূ লক্ষ্মী প্রতিমা। কী সুন্দর। চোখ আছে ভদ্রলোকের। সে তখন আয়নায়, সে তখন বাথরুমে, নিজেকে দেখতে দেখতে কেমন অভিভূত হয়ে পড়ে। পুষ্ট স্তন, উরুমূলে বিজলি বাতির প্রভা, কালো মেঘের মতো চুলের ঢেউ, আর শরীরে আশ্চর্য সুষমা। বড়ো হতে হতে টের পেয়েছে, শরীরে একটা ফোসকা পড়লেও কষ্ট।

দামি লোশন, এবং বাজারের সব বিজ্ঞাপনের ছবির মতো তার বাড়িটায় উড়ে বেড়াতে ভালো লাগে। কেবল ওই ঘরটার দিকে চোখ গেলেই হিম হয়ে যায় শরীর।

সাঁঝবেলার আগেই ছাদ থেকে সে সবার জামা প্যান্ট শাড়ি শায়া নামিয়ে আনে। রবিবার বলে রূপক বিছানায় আটকে রেখেছিল, সারা দুপুর বিকেল সে শরীরের সর্বস্ব দিয়ে রূপকের সঙ্গে মেতেছিল—তারপর বাথরুম এবং আয়না, পাতায় আইল্যাশ, চোখের নীচে নীলাভ রঙের পালকের স্পর্শ সেরে যখন বের হয়ে এল একেবারে অপ্সরা।

ও বউমা ছাদ থেকে জামাকাপড় নামিয়েছ? এ-কাজটা এখন সে বাড়ির করে থাকে। জিভ কেটে দৌড়ে সিঁড়ি ভেঙে ওপরে উঠে গেল। আশ্চর্য আকাশ মাথার ওপর, নীল নক্ষত্র আকাশে ভাসমান, বসন্তের শীতল হাওয়া—তার ছাদ থেকে নেমে আসতে ইচ্ছে

হচ্ছে না। আর তখনই মনে হল, এই বাড়ির এক কোণে জ্যান্ত এক নরকঙ্কালের বাস। সঙ্গে সঙ্গে ভয়। ছুটে তার থেকে সব টেনে পড়িমরি করে নেমে আসতেই সে দেখল চাতালের অন্ধকারে কিছু নড়াচড়া করছে। সে কাছে যেতে সাহস পাচ্ছে না। তব নামতে হবে। সিঁড়ির পাশে কেউ-কে সে। অন্ধকারে দেখল, বুড়ি খুট খুট করে ট্রাঙ্কের ভিতর চাতালের নীচে কী খুঁজছে।

শরীর তার হিম হয়ে গেল। বেহুশ। কোনোরকমে দেয়াল ধরে বসে পড়ল। তারপর গোঙানি।

এই ঘটনার পর পরই বউমাকে ধীরাজবাবু বাপের বাড়ি পাঠিয়ে দিলেন। তারপর যা হয়—বর্ষা নামতেই বাড়ি ফাঁকা করে তিনিও চলে গেলেন। শরীর তাঁর সাদা চাদরে ঢেকে দেওয়া হল।

খবর পেয়ে আত্মীয়স্বজন, চাঁপা এবং তার বাবা মা ভাই বোন সবাই এল। সবারই কৌতূহল, সিঁড়ির চাতালের নীচে কী দেখে ভিরমি খেয়েছিল বউমা!

ঠাকুমা চাতালের নীচে কী খুঁজছিল।

কী করে হয়! মাকে ধরে না নিয়ে গেলে কখনো যেতে পারেন না।

আমি যে দেখলাম বাবা।

ধীরাজবাবু বললেন, ওখানে আছে তো কটা ভাঙা ট্রাঙ্ক। মা ফেলে আসতে চাননি দেশের বাড়ি থেকে। সঙ্গে নিয়ে এসেছেন।

সিঁড়ির চাতালের নীচটা পরিষ্কার করতে গিয়ে চাঁপা সুন্দর কারুকাজ করা একটা কাঠের বাক্স পেয়ে গেল একদিন। সে গোপনে ঘরে নিয়ে বাক্সটা খুলল। কিছুই নেই। সাদা ন্যাকড়ায় জড়ানো একটা খাম। খুব যত্নের সঙ্গে রাখা। খামে আশ্চর্য সুন্দর এক টুকটুকে নতুন বউয়ের ফোটো।

সে ছুটে গেল বারান্দায়।

ধীরাজবাবু চা খাচ্ছিলেন।

কী ব্যাপার! হাঁপাচ্ছ কেন!

দেখুন দেখুন। কী সুন্দর না দেখতে নতুন বউটি! ছবিটি দেখে ধীরাজবাবু বললেন, আমার মার ফোটো। যেই বাড়িতে আসত, বলত, হ্যাঁ অন্নপূর্ণাই বটে। কী সুন্দর চোখ মুখ। ছবিটা মা কিছুতেই হাতছাড়া করত না। কোথায় পেলে! আমরা কিছু বললে, বলতেন, কোথায় রেখেছি মনে করতে পারছি না। মা বোধহয় সেদিন সিঁড়ির চাতালের নীচে ছবিটা খুঁজতে গেছিলেন। নিজের ছবির সঙ্গে মানুষের শেষ ছবির তফাত কত খুঁজে দেখছিলেন বোধহয়।